বটবৃক্ষের আশ্রয়

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

আমার বিশ্বাস, কোন ঘটনাই অকস্মাৎ ঘটে না। আমরা জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি, প্রত্যেক ঘটনার পিছনে ঈশ্বরের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। আমার জীবনে নরেন্দ্রপুরের সংযোগ ঈশ্বরের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। আজ আমার সত্তরোর্ধ জীবনে যখন ফেলে-আসা দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাই তখন আমার এই জীবনের, সে-জীবন যত সামান্যই হোক না কেন, পিছনে অদৃষ্ট কারও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনারই হাত উপলব্ধি করতে পারি। সাধারণ একটি ঘটনা একজন সাধারণ মানুষের জীবনে কী ভূমিকা নিতে পারে যে, তা সেই মানুষের গোটা জীবনের নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে তা আমার জীবনে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। তা সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার চোখে ধরা পড়েনি, কিন্তু যতই দিন গেছে, আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা যত বেড়েছে ততই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি এবং আজও করছি যে, সেই একটি ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে যা কারও না কারও, হয়তো সকলের জীবনেই ঘটে বা ঘটতে পারে, তা আমার জীবনে কী অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আমি মেলাতে পারি না, হয়তো আমার চেয়েও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন আমাদের স্বনামধন্য পরিবারের কারও কারও জীবনে অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রেই কিভাবে এমন ঘটনা ঘটে গেল! তখন কিন্তু একবারের জন্যও বুঝতে পারিনি যে, আমার জীবন এক অদৃশ্য যাদুকরের সূতোয় ধরা আছে, তিনি তাঁর যেমন ইচ্ছে তেমন আমাকে চালিয়েছেন এবং আজও চালিয়ে নিয়ে চলছেন। তাঁর মুঠিতেই ধরা আমার জীবন। আমি তো অসাধারণ কেউ নই, কিন্তু আমার মতো সাধারণ জীবন যদি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে মহৎ কোন জীবন তো হবেই। বস্তুত, ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "গাছের পাতাটিও নড়ে না"। আমার জীবনে আমার অভিজ্ঞতায়, যত সামান্য অভিজ্ঞতাই তা হোক, বুঝেছি তাঁর কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সূচনার সূচনা

প্রত্যেক সূচনারই একটি সূচনা থাকে। প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন প্রদীপের সলতে পাকাতে হয়, তেমনি প্রতিটি মানুষের জীবনের সূচনার একটি সূচনা থাকে। আমার জীবনের শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। সেই গ্রামে আমাদের পরিবারেরই কেউ বিলেতে এফ. আর. সি. এস ডাক্তার হয়েছেন(লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন আর দেশে ফিরে আসেননি. ওদেশের মেয়েকে বিয়ে করে ওদেশেই রয়ে গিয়েছেন।), কেউ নামী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছেন, কেউ আমেরিকায় পি.এইচ.ডি করে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির প্রধান অধ্যাপক হয়েছেন, কেউ-বা আই. এ. এস. হয়ে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার জেলাশাসক এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব হয়েছেন । আমি তখন তাঁদের কথা শুনতাম, তাঁদের দেখতাম আর ভাবতাম---ওঁরা তো আমাদেরই পরিবারের মানুষ, আমি কি ওঁদের মতো কেউ হতে পারব কোনদিন? প্রসঙ্গত বলি যে, জন্মসূত্রে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদেরই বংশের সন্তান। যখনকার কথা বলছি তখন ওঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হুগলীর জেলাশাসক, আরেকজন প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির বিভাগীয় প্রধান (তখন rotation পদ্ধতিতে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্তি প্রথা শুরু হয়নি।) আরেকজন কান্দী রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কেউ বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে উচ্চপদস্থ আধিকারিক। আমার চোখের সামনে তখন দুটি স্বপ্ন। আমাকে সবচেয়ে বেশি টানত একটি আই. এ. এস. হওয়া এবং অন্যটি প্রফেসর হওয়া। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে এসে গেল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাস। তখন আমার মামার বাড়ি বীরভূম জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম দক্ষিণগ্রামের নতুন স্কুল জগত্তারিণী বিদ্যায়তন থেকে আমরাই প্রথম ব্যাচ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেব। জগত্তারিণী আমার বড় দিদিমার নাম। তাঁর নামেই তাঁর একমাত্র ছেলে স্কুলটি করে দিয়েছেন। কিন্তু স্কুল বোর্ডের রেকগনিশন পায়নি তখনো। ব্যবস্থা হলো মল্লারপুরের কাছে জামালপুর হাইস্কুল থেকে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে সেখানকার ছাত্র হিসেবে আমরা ফাইন্যাল পরীক্ষা দেব। ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৬ আমাদের টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো।

জামালপুরের রেগুলার ছাত্রদের তুলনায় ভাল ফল হলো আমাদের। আমার এবং আমাদের স্কুলের আরেক ছাত্র তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামালপুরের সকল ছাত্রদের থেকেও ভাল ফল হলো।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৬ ছিল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফরম ফিল আপ-এর শেষ দিন। মনটা খুব খারাপ এই ভেবে যে, নিজেদের স্কুল থেকে আমরা জীবনের প্রথম পরীক্ষায় বসতে পারব না। ১লা ডিসেম্বর ১৯৬৬ আমরা জামালপুর হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে ফরম ফিল-আপ করলাম। হঠাৎ ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৬ কলকাতা থেকে কেষ্ট-দা অর্থাৎ দক্ষিণগ্রামের কৃতী সন্তান বিচারক কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মাধ্যমে আমাদের স্কুলের হেড মাস্টারের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছল যে, আমাদের স্কুল বোর্ডের রেকগনিশন পেয়েছে এবং আমরা আমাদের নিজেদের স্কুল থেকেই সেবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারব। আমরা আবার নতুন করে ফরম ফিল-আপ করলাম। যথাসময়ে আমরা মার্চের প্রথমে রামপুরহাট কলেজে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসলাম। কলেজের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন দক্ষিণগ্রামের শ্রীমিহির রায়। তিনি ছিলেন রামপুরহাট কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, আমরা যে ছয়জন ছাত্র আমাদের স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম তারা সকলেই 'পাশ' করেছে। আমি এবং তাপস প্রথম বিভাগে এবং আমরা দুজনেই জাতীয় বৃত্তি পেয়েছি। আমার বাবার ইচ্ছা ছিল আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ব। সে অনুসারে বাবার নির্দেশে আমার দাদা (তিনি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর কর্মী ছিলেন) আমাকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আমাদের গ্রাম কল্যাণপুর থেকে আঠারো মাইল দূরে রেলস্টেশন সাঁইথিয়া। সেখানে স্টেশনের গায়ে লাগানো নন্দিকেশ্বরী তলা, একান্ন পীঠের অন্যতম একটি বিখ্যাত সতীপীঠ। সতীর কণ্ঠহার পড়েছিল বলে কথিত আছে। সাঁইথিয়া স্টেশন থেকে তখন দিনে মাত্র দুটি ট্রেনে কলকাতা যাওয়া যেত। একটি সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটে আর একটি বিকেল ৪.৩০ মিনিটে। এখন হয়তো আরো অনেক ট্রেন হয়েছে, কিন্তু তখন ঐরকমই ছিল। দাদা এবং আমি বাসে সাঁইথিয়া স্টেশনে এসে পৌঁছলাম, কিন্তু বাসটি যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন শুনলাম পাঁচ মিনিট আগে কলকাতার ট্রেনটি ছেড়ে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ আমরা ট্রেনটি 'মিস' করলাম। এই ট্রেন মিস করার ব্যাপারটাই যে আমার সারাজীবনের একটি নির্ণায়ক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে তা তখন জানতাম না। সেই বিকেল ৪.৩০ মিনিটে পরবর্তী ট্রেন। এতক্ষণ স্টেশনে বসে থাকতে হবে! কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে সাঁইথিয়ার নতুন কলেজ অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, আপনাদের এই দুটি ছাত্রকে আমাদের কলেজে ভর্তি করে দিন। ওরা আমাদের হোস্টেলেই থাকবে, ওদের থাকা-খাওয়া এবং পড়াশুনোর সব দায়িত্ব আমরা বহন করব। হেডমাস্টার চিঠিটি আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন--"এই চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন সাঁইথিয়ার নতুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তুমি ইচ্ছে করলে চিঠিটি ব্যবহার করতে পার।" ট্রেন মিস করার পর আমি দাদাকে বললাম ঃ "এখন তো অনেক সময় স্টেশনে বসে থাকতে হবে। চল না, নতুন কলেজটা একবার দেখে আসি।" দাদা আমার কথায় আমাকে নিয়ে সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে যাওয়ার জন একটা রিক্সা নিয়ে চলল। সাত-আট মিনিট পর শহরের একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় আমাদের রিক্সাটি থামল। দেখলাম নতুন বিল্ডিং উঠছে, একজন সন্ন্যাসী কাজের তদারকি করছেন ছাতা হাতে। ওঁর দৃষ্টি পড়ল আমাদের দিকে। তিনি দ্রুত এসে খপ করে আমার ডান হাতেটা চেপে ধরে বললেন ঃ "তুই ঐ দুটোর আরেকটা ছেলে না, যে এবার স্কুল ফাইন্যালে ভাল রেজাল্ট করেছে?" আমি বা দাদা কিছু বলার আগেই আমাকে হাত ধরে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন কলেজের অফিসে এবং সেখাসে অফিসের হেড ক্লার্ককে বললেন ঃ "একে ভর্তি করে নাও।" ওর হাত থেকে বাঁচার জন্য দাদা একটি মিথ্যা কথা বললেন ঃ "আমরা তো ভর্তির কোন টাকাপয়সা নিয়ে আসিনি।" সন্ন্যাসী বললেন ঃ "আপনার কাছে টাকা পয়সা কে চেয়েছে? ওর টাকা পয়সা কিছু লাগবে না। নাও, কুমকুম, ওকে ভর্তি করে নাও। ওর পড়াশুনা, হোস্টেলে থাকা, বই-পত্রের সব খরচ কলেজ বহন করবে। যেমন ওদের আরেকটি ছেলের করা হয়েছে।" বুঝলাম তাপস এই কলেজে ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সন্ন্যাসী হলেন সাঁইথিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ডঃ কে.ডি. রায় তথা স্বামী কৃষ্ণানন্দ। 'কুমকুম' নামের লোকটি আমাদের অতি পরিচিতি--কুমকুম মজুমদার, দক্ষিণগ্রামের পাশের গ্রাম রাতমাতে তার বাড়ি। কলেজের হেডক্লার্ক। মামার বাড়ির সূত্রে ওঁরা আমাদের

আত্মীয়। ভর্তি তো হয়ে গেলাম। আর তো এখন আমাদের কোন কাজ নেই। সুতরাং পরের বাস ধরে ফিরে গেলাম বাড়ীতে। বাবা-মা আমাদের দেখে তো অবাক। আমাদের কলকাতার যাওয়ার কথা, এত তাড়াতাড়ি ফিরলাম কি করে এবং কেন ? বাবা সব কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। দাদাকে বললেনঃ "সাঁইথিয়া তো একটা petty College, নতুন শুরু হয়েছে, ওখানে কেন ওকে ভর্তি করে এলি ? বললাম, সোজা কলকাতা যাবি এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করবি, কিন্তু ওকে সাঁইথিয়ায় ভর্তি করে চলে এলি!"

তখন কে জানত যে, ঐ ট্রেন মিস করা এবং সাঁইথিয়া কলেজে ভর্তি হওয়াটা ছিল আমার জীবনে দৈবনির্দিষ্ট! সাঁইথিয়া কলেজ থেকে পরের বছর আমি ইউনিভার্সিটি এন্ট্রাস পরীক্ষায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করলাম। এবার বাবা বললেন ঃ "এবার আর অন্য কোথাও নয়, সোজা প্রেসিডেন্সী কলেজ। সেখানে ওকে ভর্তি করাতে হবে, এবার আর কাউকে ওকে নিয়ে যেতে হবে না কলকাতা। দেবুকে বলে দিচ্ছি, দেবু ওকে নিয়ে কলকাতা যাবে।" 'দেবু' অর্থাৎ 'দেবু মাস্টার' আমার স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক দেবীপ্রসাদ রায়। আমার খুব প্রিয় শিক্ষক। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। দেবু মাস্টারের জেঠতুতো দাদা কেষ্ট-দা(কৃষ্ণচন্দ্র রায়) ছিলেন কলকাতার স্মল কজেস কোর্ট-এর চীফ জাজ। দেবু-দা সিঁথিতে কেষ্টদার বাড়িতে আমাকে নিয়ে উঠলেন। দক্ষিণগ্রামের লোক কেষ্ট-দা কে অনেক আগে থেকেই চিনতাম, তাঁর স্ত্রীকেও চিনতাম। তাঁর বড় মেয়ে শুভ্রা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। আর বড় ছেলে সুযু বা সূর্য আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। ওরাও আমার খুব পরিচিত। দক্ষিণগ্রামে পড়াশুনার সুবাদে ওদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। কেষ্টদার বাড়িতে ওঠার পরদিন দেবু-দা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখানে আমাদের কাকা ডঃ ডি. এন. চ্যাটার্জী কেমিস্ট্রির হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট। তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন ঃ "এখন এখানে নকশালদের খুব আন্দোলন চলছে, এখানে এখন পড়াশুনার অ্যাটমোসফিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে। তুই গ্রামের ছেলে, এখানে কি অ্যাডজাস্ট করতে পারবি? তুই বরং নরেন্দ্রপুরে ভর্তি হয়ে যা। ওখানে রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজ, খুব ভাল কলেজ, ওখানে খুব শান্তির পরিবেশ। তোর পক্ষে ওটা সবচেয়ে ভাল হবে।" কিন্তু বাবা বলে দিয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে। সেকথা কাকাকে বলায় তিনি বললেন ঃ "দাদা কে (আমার বাবা) আমি বুঝিয়ে বলব।" কিন্তু বাবার ইচ্ছেকে মান্যতা দিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের নিয়মমতো কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টে বসলাম এবং নির্বাচিত হলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের যে ঘরে আমার অ্যাডমিশন টেস্ট হলো সেখানে দেখলাম দেওয়ালে গোটা গোটা অক্ষরে কালি দিয়ে লেখা আছে এই কথাগুলি

হাত দিয়ে বল সূর্যের আলো রোধিতে পারে কি কেউ?
আমাদের মেরে ঠেকানো কী যাবে জনযুদ্ধের ঢেউ?

নকশাল আন্দোলনের শ্লোগান। বুঝলাম কেন কাকা প্রেসিডেন্সী কলেজে আমি পড়ি তা চাইছেন না। সাঁইথিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কথাটা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন ঃ "প্রেসিডেন্সী নয়, তুই নরেন্দ্রপুওে পড়বি। ওখানে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী আছেন, এখন ওটাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজ।" পরদিন দেবু-দা আমাকে নিয়ে চললেন নরেন্দ্রপুর। দেখলাম বিরাট রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স--স্কুল, কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল, ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি, ছোটখাট হাসপাতাল--আরোগ্যভবন, এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং কলেজ এবং ১০/১২টি হোস্টেল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, লোকশিক্ষা পরিষদ। বিশাল বিশাল কয়েকটা খেলার মাঠ। দেখে তো আমার মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়।

আশ্রমে ঢোকার মুখেই বিরাট সবুজ মাঠ, সেখানে ছাত্ররা ফুটবল খেলছে। আমাকে ভর্তি করার জন্য সাঁইথিয়া থেকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ কে. ডি. রায় (স্বামী কৃষ্ণানন্দজী) সঙ্গে এসেছেন। আমাকে ওঁরা নিয়ে গেলেন সেন্ট্রাল অফিসের দোতলায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের অফিসে। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলাম। অত্যন্ত সুদর্শন, দীর্ঘদেহী হাস্যোজ্জ্বল সন্ন্যাসী। খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। সাঁইথিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ওঁকে প্রণাম করলেন। ওঁকে লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ চিনতেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর আমার কথা শুনে বললেন ঃ "আমি রঞ্জনকে(স্বামী মুমুক্ষানন্দজী) বলে দিচ্ছি। তোমাকে আমাদের নিয়মমতো একটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে।

কোন অসুবিধা হবে না, তুমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যান্ড করা ছাত্র।" ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পড়ব শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন ঃ "খুব ভাল।" পরে জেনেছিলাম উনিও ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পড়েছেন। সেজন্য ইংরেজীর ছাত্রদের বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন। কৃষ্ণানন্দ মহারাজকে লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ বললেন ঃ "আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা সবাই দুপুরে এখানে খেয়ে নেবে কর্মীভবনে।" তাঁর নির্দেশমতো কলেজে গেলাম। সেখানে দেখলাম এক তরুণ সন্ন্যাসীকে। বয়স কত বোঝা যায় না, মনে হলো ওঁর বয়স ৩৫ বছর হবে। তিনি স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অত্যন্ত শান্ত ও মৃদুভাষী। সবাই তাঁকে 'রঞ্জনদা' বলে। শুনলাম দর্শনে এম.এ. তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তাঁর নির্দেশে আমার একটি পরীক্ষা হলো। পরীক্ষায় একটি মাত্র প্রশ্ন---'তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?' মনে আছে, 'আবু বেন আদম'-কবিতাটি উল্লেখ করে আমি লিখেছিলামঃ "আমি মানুষের সেবা করতে চাই।" মনে আছে, কেষ্ট-দার বাড়িতে এসে আমার লেখাটা পুরোটা ওঁকে বলতে হয়েছিল। আমি রঞ্জন-দাকে বললাম আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে গিয়েছি। শুনে মুমুক্ষানন্দজী বললেন ঃ "তাতে কোন অসুবিধা নেই, একই বিশ্ববিদ্যালয়, যা করার আমরা করে নেব।" ইতিমধ্যে তাঁর ঘরে ঢুকলেন অধ্যাপক কে সি ঘোষাল, কলেজের ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক। তাঁর হাতে আমার পরীক্ষার খাতা। তিনি মহারাজকে বললেনঃ " ছাত্রটি বেশ ভাল, খুব ভালই লিখেছে।" মহারাজ বললেন ঃ "তাহলে ওকে আমরা ভর্তি করে নিলাম।" টাকা-পয়সার কথা কিছু বললেন না। আমরা ওখান থেকে গেলাম কর্মীভবনে। সেখানে দুপুরের খাওয়া হলো। খাওয়া, পরিবেশ দেখে আমরা তো মুগ্ধ। শুনলাম, ওখানে গতকাল থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমি বললাম ঃ "আমি ২০শে জুলাই আসব।" সেদিন ছিল ১৭ জুলাই ১৯৬৭। কলকাতা থেকে কল্যাণপুরে বাড়িতে ফিরলাম। প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি না হয়ে নরেন্দ্রপুর ভর্তি হওয়াতে বাবা মনে হলো, খুশি হলেন না। রাশভারি মানুষ, বেশি কথা বলেন না। ২০শে জুলাই নরেন্দ্রপুর ফিরলাম।

নরেন্দ্রপুরের জীবন

২১ জুলাই ১৯৬৭ থেকে শুরু হলো আমার নরেন্দ্রপুর জীবন। ক্রমে মুমুক্ষানন্দজীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। সাঁইথিয়ায় একবছর হোস্টেলে জীবন কাটিয়েছি, কিন্তু নরেন্দ্রপুরের হোস্টেল জীবনে অনেক বেশি শৃঙখলাপরায়ণতা, সেখানে অনেক বেশি রামকৃষ্ণ-ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অবকাশ। মুমুক্ষানন্দজী প্রায়ই বলতেন ঃ "দেখ, এখানকার এই শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনকে তোমরা শৃঙ্খল মনে করো না, এই জীবনটা তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন মানসিকতাকে মনে স্থান দিয়োনা। এই discipline-কে super-imposed ভেবো না, self-imposed করে নাও। তাতে তোমাদের জীবনটা সার্থকতা লাভ করবে। Discipline super-imposed is no discipline at all. Discipline must be self-imposed. সেটি করে দেখ এবং তার সুফল জীবনে পাবে। যখন পাশ করে এখান থেকে চলে যাবে তখন দেখবে, তোমাদের ভাই বা নিকট আত্মীয়দের এখানেই আনতে চাইবে।" কথাগুলি প্রায়ই রঞ্জন-দা আমাদের বলতেন, কিন্তু তা বলে কখনো একঘেয়ে মনে হতো না। ঐ জীবনটা যে সত্যিই আমাদের জন্য অপরিহার্য তাই ভাবতাম। পরে আমার ছোট ভাই কৃষ্ণ এবং ভাগ্নে তড়িৎকেও নরেন্দ্রপুর কলেজে ভর্তি করেছিলাম। ওরাও নরেন্দ্রপুর থেকেই গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল।

দেখতে দেখতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটতে লাগল। আশ্রমকে ভালবেসে ফেললাম। দেখতে দেখতে কলেজে বি.এ. ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেল। মনে আছে শেষ পরীক্ষা ছিল ২০ শে জুন ১৯৭০। ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটল। আশ্রমের সমস্ত বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের উস্কানিতে ঐদিন থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিল। ঠিক ছিল পরদিন ২১শে জুন বাড়ি চলে যাব। রাত্রিতে বিদায় নেবার জন্য রঞ্জনদা-র ঘরে গেছি। রঞ্জন-দাকে প্রণাম করে বললাম ঃ "কাল সকালে বাড়ি চলে যাব।" রঞ্জন-দা বললেনঃ " আশ্রমের এখন বিপদ শুরু হলো। আজ থেকেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। রান্নাঘরের কর্মীরা সব চলে গেছে, সুইপার, দারোয়ান, পিওন সবাই চলে গেছে। আজ তোমাদের রান্না, বিকেলের টিফিন, রাত্রের খাওয়া বানিয়েছে তোমাদের অধ্যাপকেরা। এই দুঃসময়ে তুমি আশ্রম থেকে চলে যাবে? আশ্রমের জন্য তোমাদের কি কোন কর্তব্য নেই?" বললাম ঃ "আপনি কি করতে বলেন?" রঞ্জন-দা বললেনঃ "এখন আশ্রমে থেকে যাও। তোমাদের

এখন অনেক কাজ। তোমাদের অধ্যাপকরা সব পারবেন না। তোমরা ওঁদের সঙ্গে হাত লাগাও।" আমার আর বাড়িতে যাওয়া হলো না। নরেন্দ্রপুর রয়ে গেলাম। রঞ্জন-দা বললেন ঃ "কোন গেটে দারোয়ান নেই। সবাই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। তোমাকে মেইন গেটে দারোয়ানের duty করতে হবে। তোমার সঙ্গে পালাক্রমে থাকবেন অন্য অধ্যাপকরা এবং কলেজের অন্যান্য ছাত্র, থাকবেন আশ্রমের আবাসিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকশিক্ষা পরিষদের প্রবীণ (বয়স তখন ৭৫) পরিচালক শ্রী জি. এস. শুক্লা(ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রাক্তন আধিকারিক, তখন আশ্রমিক), প্রমূখ।"

ধর্মঘটে আশ্রমের কাজ যথারীতি চলতে থাকল। পঁয়ত্রিশ দিন পর কর্মীদের বৃহৎ অংশ পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে আশ্রমে ফিরে এলো। মেন গেটে কাজ করার জন্য গেটের সামনে কর্মীদের পক্ষে স্থানীয় বামপন্থী রাজনীতির কর্মকর্তারা সভা ডেকে চারটি খতম-তালিকা টানিয়ে দিয়েছিল। তাতে প্রণবরঞ্জন ঘোষ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুক্লাজীদের সঙ্গে আমার নামও ছিল। মুমুক্ষানন্দজীর প্রিয়পাত্র ছিলাম, এখন মেন গেটে দারোয়ানের কাজ করার সুবাদে লোকেশ্বরানন্দজীও আমাকে চিনলেন, আগেও চিনতেন ঠিকই, কিন্তু এখন থেকে আমাকে আমার নামেও চিনলেন। এমনই তাঁর আকর্ষণ ছিল যে, রোজ সকালে অথবা সন্ধ্যায় তাঁর কাছে মঙ্কস কোয়ার্টার্সে যেতাম। একদিন দেখলাম, সকালে মহারাজ 'শেভ' করছেন ছোট একটা আয়না টেবিলের সামনে রেখে, বাঁ হাতে ধরা একটা ছোট কৌটোর মধ্যে বিস্কুটের টুকরো একটা করে হাতে নিয়ে ধরে রয়েছেন আর শালিক পাখিগুলো তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে। একদিন দেখলাম মহারাজ 'শেভ' করছেন ডান হাতে, বাঁ হাতে ধরা বিস্কুটের টুকরো নেওয়ার জন্য দুটো শালিক মহারাজের বুকের কাছে কাড়াকাড়ি করছে। আর একটি শালিক মহারাজের কাঁধে উঠেছে, আরও একটি হাতের 'রিস্টে' বসেছে। বুদ্ধদেব মহারাজ(স্বামী বিনয়ানন্দজী--এখন প্রয়াত) একটি ফটো তুললেন। ফটোটি বহুদিন আমার কাছে ছিল, এখন কোথায় হারিয়ে গেছে।

সেদিন ছিল কালীপূজার আগের রাত। সন্ধ্যার প্রার্থনার পর মহারাজের ঘরে গেছি। দেখলাম মহারাজ তাঁর ঘরে বসে একটি বই পড়ছেন, ঘরের মধ্যে শ্যামাপোকা উড়ছে। উত্তরদিকের দরজায় তাকিয়ে দেখি একটা বড় সাইজের চিতি সাপ শ্যামাপোকা খেয়ে চলেছে। নরেন্দ্রপুরে যখন তখন যেখানে সেখানে সাপ ঘুরে বেড়ায়। এসব দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মহারাজ নিবিষ্ট মনে বইটি পড়ছেন। দেখলাম সাপটি মহারাজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মহারাজও তার দিকে তাকিয়ে। মহারাজের বোধ হয় মনে হলো সাপটা ভয় পেয়েছে। তিনি সাপটার দিকে তাকিয়ে স্বভাবসিদ্ধ গলায় শান্তভাবে বললেনঃ " তুমি নিশ্চিন্তে তোমার খাবার খাও, আমি আমার কাজ করি।" দেখলাম সাপটি চোখ নামিয়ে মনের সুখে শ্যামাপোকা খেতে লাগল।

কর্মীভবনে একটি দেশী পুরুষ কুকুর, একটি দেশী মেয়ে কুকুর ছিল। সব মহারাজের পোষা। পুরুষ কুকুরটিকে মহারাজ ডাকতেন ভুলু বলে, মেয়ে কুকুরটিকে ডাকতেন তুলি বলে। এছাড়া ছিল একটি বড় সাইজের বিড়াল, মহারাজ তাকে ডাকতেন বুড়ো বলে। ছিল একটা বুনো মেয়ে বিড়াল বা জংলী বিড়ালও। মহারাজ তাকে ডাকতেন বিশাখা বলে। মহারাজ কর্মীভবনে দুপুরে খাওয়ার পর ডাইনিং হলের বাইরে এসে ডাক দিতেন বুড়ো, বিশাখা, ভুলু, তুলি! সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই লাইন করে এসে দাঁড়াত, মহারাজের নির্দেশে বিমল বা অন্য কেউ ওদের খাবার দিত। কেউ ঝগড়া করত না। স্ফূর্তি করে সবাই একসঙ্গে মনের আনন্দে খেত। মহারাজের সেই ডাক এবং ওদের লাইন করে আসা একটি দেখার মতো দৃশ্য ছিল। আরো পরে একটি কালো রংয়ের স্প্যানিয়েল পথ ভুলে মহারাজের ঘরের সামনে চলে আসে। সে মহারাজের পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। মহারাজ তাকে কোলে তুলে নিলে সে মহারাজের বুকে মুখ ঘসতে থাকে। মহারাজ তার নাম দিলেন 'স্যাফায়ার'। স্যাফায়ার মহারাজের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখন থেকে স্যাফায়ার মহারাজের সঙ্গী হয়ে উঠল।

তখন তো নকসাল আন্দোলনের দেশময় ঝোড়ো আবহাওয়া। আমাদের কলেজ ও হোস্টেলের ভবনগুলির সাদা দেয়ালে কিন্তু কোন আঁচড় পড়েনি। তিন বছর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্লাসরুমের দেয়ালে নকসাল ছাত্রদের

শ্লোগান দেখেছিলাম। সংবাদপত্র খুন, হত্যা, অপহরণের সংবাদে ভর্তি হয়ে থাকত। কিন্তু স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের নরেন্দ্রপুরে তার কোন আভাস পেতাম না। নরেন্দ্রপুরের কত ঘটনাই না মনে পড়ছে। সেবার ছিল কলেজের কনভোকেশন। কনভোকেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন ডঃ পি.সি. রক্ষিত। প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রির বিখ্যাত অধ্যাপক। তিনি নরেন্দ্রপুরেও সপ্তাহে দু-তিনদিন পড়াতেন। কেমিস্ট্রির ছাত্ররা বলত ডঃ রক্ষিত অসাধারণ পড়ান। আমি তো ইংরেজী অনার্সের ছাত্র, ওঁর পরানোর সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না। তবে বন্ধুদের কাছে ওঁর নাম ও পড়ানোর সুখ্যাতি খুবই শুনতাম। ডঃ রক্ষিতের সমাবর্তন ভাষণ বাংলায় হয়েছিল। সে কি অসাধারণ ভাষণ, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমরা সবাই তাঁর ভাষণ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা, তেমনি তাঁর ভাষণ। কণ্ঠস্বর ছিল যেন যাদুময়। সেদিনের সমাবর্তন সভায় জলদগম্ভীর কণ্ঠে ডঃ রক্ষিত বলেছিলেনঃ " শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই, থাকবেই। তাতে তো সমগ্র ছাত্রসমাজ নষ্ট হয়ে গেছে, এমন ভাবা চলে না। তারা সরলমতি, আবেগতাড়িত। কত প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র আজ বিপথে চলে গিয়েছে এবং যাচ্ছে, তাতে সমগ্র ছাত্রসমাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা বলা যাবে না এবং তা ভাবাও যাবে না। তাদের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এবং তা এখনো আছে। এখনকার মত্ততা দেখে তাদের এবং সমস্ত ছাত্রসমাজকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আমরা বিশ্বাস করি, এই বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছেন, জন্মেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। তাঁদের আদর্শ আজও আমাদের মধ্যে দীপ্যমান এবং তা চিরকাল দীপ্যমানই থাকবে। আজকের মত্ততা একদিন থেমে যাবে। নতুন আলো আসবে, আসবেই আসবে। আমরা নিশ্চয়ই সেই নতুন সূর্যোদয় দেখব অচিরেই। সেই সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় আমরা রয়েছি।"

এমন ভাষণ, এমন বাচনভঙ্গি, এমন শব্দচয়ন এবং শব্দের এমন প্রয়োগ এর আগে আমি কখনও শুনিনি, আমরা কেউই শুনিনি। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২-৮৩ সাল হবে, শুনেছিলাম বেলুড়মঠে স্বামীজীর জন্মতিথিতে হরিপদ ভারতীর ভাষণ। তাঁর ভাষণও ছিল এমনই অসাধারণ। আজও যেন কানে বাজে। কতবছর হয়ে গেল, ডঃ পি. সি. রক্ষিত এবং হরিপদ ভারতীর ভাষণ আজও আমি ভুলতে পারিনি।

নরেন্দ্রপুরের আর একটি স্মৃতি, যা আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। তা ছিল অবশ্য আরো পরের ঘটনা। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাস। সেদিন ছিল স্বামীজীর জন্মতিথি। নরেন্দ্রপুর বিবেকানন্দ শতবার্ষিক হলে সকালে স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে অন্যান্য বারের মতো সভা চলছে। সভায় সভাপতিত্ব করছেন যথারীতি পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ । স্কুলের একটি ছাত্র নজরুলের সেই বিখ্যাত গানটি গাইছিল---"যজ্ঞাহুতির হোমশিখাসম তুমি তেজস্বী তাপস পরম----" স্বামীজীর সম্পর্কে নজরুলের অমর কথাগুলি বিশাল সভাগৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সভা শেষ হলো। হল থেকে বেরিয়ে বাইরে এসেছি। দেখলাম "শালপ্রাংশু মহাভুজ" স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী হল থেকে বেরিয়ে আসছেন। বাহিরে নীল ডজ গাড়িটি অপেক্ষা করছে মহারাজ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীর-ব্রহ্মচারীরা বেলুড় মঠ যাবেন। মহারাজ এসে সামনে আমাকে দেখে বললেনঃ " চল, আমাদের সঙ্গে । আমরা মঠে(বেলুড় মঠে) যাব। স্বামীজীর জন্মতিথি আজ। মঠে গিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করে বলবে, 'স্বামীজী, আমার মাথাটা আজ আপনাকে দিলাম। আমার জীবনটা আপনাকে দিলাম।' এই প্রথম মহারাজ আমাকে সরাসরি সোজাসুজি সাধু হতে বললেন। এতদিন মহারাজের সঙ্গে আসছি যাচ্ছি, কোনদিন এমন সোজাসুজি সাধু হওয়ার কথা বলেননি । আজ বললেন। তাঁর কথায় এমন একটি জোড় ছিল যে, মঠে গিয়েও সারাদিন তাঁর কথাগুলি আমাকে আলোড়িত করে চলল। রাত্রে আমার ঘরে বিছানায় শুয়েছি, কিন্তু ঘুম আসছে না । উত্তেজনায় অস্থির হয়ে এপাশ ওপাশ করছি বিছানায়। আমার রুমমেট ছিলেন সত্য-দা, আজকের গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দজী। বয়সে আমার চেয়ে দুবছরের বড়, পড়াশুনোতেও দু-ক্লাস সিনিয়র। আমি যখন নরেন্দ্রপুরে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি, তখন তিনি নরেন্দ্রপুরে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি আমার অস্থিরতা দেখে বললেনঃ "কি হলো তোমার? এমন ছটফট করছ কেন?" আমি বললামঃ "সত্য-দা, আজ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম। আমি সঙ্ঘে জয়েন করব।" সত্য-দা বললেন ঃ "আরে, এখন ঘুমোও তো।" আমি বললামঃ "না, সত্য-দা আর দেরী করা যাবে না। আমি জয়েন করবই সত্য-দা। সত্য-দা বললেন ঃ " সে হবে এখন

। এখন তো ঘুমোও।" আমি বললাম ঃ " না, সত্য-দা, আপনাকেই প্রথম আমার সংকল্পের কথা জানালাম। আজ স্বামীজীর জন্মতিথি--- আজই এই সংকল্প নিলাম," সত্য-দা বললেন, " স্বামীজী চাইলে তা-ই হবে। এখন তো ঘুমোও।"

আমার মনে হলো---আজ আমি আমার আশ্রয়কে চিনেছি। নরেন্দ্রপুর আমার সেই আশ্রয় যে-আশ্রয় আমাকে আমার পরমাশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছে। নরেন্দ্রপুর আমার বটবৃক্ষ। সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল বলেই আমি আজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করতে পেরেছি। নরেন্দ্রপুর থেকেই আমার সবকিছু। সেকথা আবার সুযোগ পেলে বলা যাবে।